সংক্ষিপ্ত ও পূর্ণ রবিজীবনের খোঁজে ❑ অঞ্জন চক্রবর্তী

রবীন্দ্রনাথের মতো কৃতী মানুষের জীবনকে জানা ও বোঝার প্রয়াস তাঁর রচনা নিয়ে বিবিধ গবেষণা সমানতালে ঘটে চলেছে। চলেছে জীবন ও রচনাকে মিলিয়ে তাঁর অত্যাশ্চর্য প্রতিভার সুষমাকে খোঁজার অন্বেষণ। কবির নিজেরই লেখা জীবনস্মৃতি, ছেলেবেলা ও পরবর্তীকালের আত্মপরিচয় এ বিষয়ে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য যদিও এখানে তাঁর পূর্ণজীবনকে মেলে ধরার চেষ্টা করেননি, বরং কিছু পরেই নামিয়েছেন এক আশ্চর্য রহস্যাবরণ। জীবনীর ক্ষেত্রে প্রভাত মুখোপাধ্যায়, প্রশান্ত পাল, কৃষ্ণ কৃপালনির গবেষণা নিবিড় ও পরিশ্রমী। এ বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনার প্রয়োজন জগদীশ ভট্টাচার্যের দুই খণ্ডে রচিত কবিমানসী, যা কবির জীবন ও কাব্যকে মেধা ও উপলব্ধির আলোয় উদ্ভাসিত করে সেতুবন্ধনের কাজ করেছে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে জানার প্রয়াস তো শুধু নির্দিষ্ট কোনো ধারায় সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। তিনি যেমন অপরূপভাবে গড়তে জানেন, ভাঙতেও জানেন অপূর্বভাবে। নিজেকে নিত্য ভাঙা-গড়ার মধ্যে দিয়ে দেখার তাগিদ তাঁর নিজের মধ্যেই ছিল। সেই থাকার প্রতিফলন বিচ্ছুরিত হয়েছে তাঁর সৃষ্টিকর্মে, নিজেই বলছেন তিনি—আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না।

তাই আত্মকথা লিখতে বসে যিনি কিছু আত্মমোচনের সঙ্গে সঙ্গে নামিয়ে আনেন রহস্যের গভীর ও সকৌতুক আবরণ, তিনিই আবার নিজের খেয়ালের ঝড়ে উড়িয়ে দেন, তাঁর 'আমি'র আবরণ। ঠিক এমনটিই ঘটে গেছে 'পত্রপুট' কাব্যগ্রন্থের 'কবি আমি ওদের দলে' কবিতাটিতে। চকিত আঁচড়ে এই অত্যাশ্চর্য লেখাটি যেন তুলে এনেছে প্রায় পূর্ণ রবীন্দ্রনাথকেই। নাতিদীর্ঘ এই সৃষ্টির পরতে পরতে যেন আত্মসমীক্ষা এবং তার বিকিরণ, উঠে আসে তাঁর আত্মসন্ধান। নিজের সঙ্গে আবহমান সময়কে, সমাজকে, ইতিহাসকে, ধর্মকে এবং অবশ্যই প্রেমকে টেনে এনে যেন স্খলিত করে ফেলে সহজেই 'এ আমির আবরণ'কে। আমরা এই অভাবনীয় উৎসারকেই অসীম মুগ্ধতা ও কৌতুহলে দেখার চেষ্টা করবো।

২

এক শিশু বেড়ে উঠেছিলো চাকরদের অনুশাসনের গন্ডীতে। জানলা দিয়ে মাথায় বিশাল জটা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা বটগাছটি ছিলো তার কাছে এক আশ্চর্য সপ্রাণ অস্তিত্ব নিয়ে। এ বিচ্ছিন্নতার জগতে দাঁড়িয়ে তার আশ্চর্য কল্পনাপ্রবণ, সৃষ্টিশীল মন ব্যাপ্ত হয়ে উঠবে সর্বকালের সেরা এক সৃষ্টির জাদুকরের প্রতিভা। এতো গেলো একটা দিক। কিন্তু এই পাড়াপড়শিময় সামাজিকতায় লালিত না হওয়া, সহজ বন্ধুপরিমন্ডলে খেলে ধুলে বড় না হয়ে ওঠা পিরালির বামুন ঘরের এই ছেলেটির প্রান্তিকতাই যে তাঁকে মিলিয়ে দেবে সমাজের অন্ত্যজ মানুষদের সঙ্গে সহমর্মিতায়, সেই রসায়নটি টের পাওয়া এত সহজ নয়। এই কবিতাটি খুব আশ্চর্যভাবেই

আমাদের সামনে এক আশ্চর্য বিদ্যুৎ খেলিয়ে মিলিয়ে দিলো না-মেলা অঙ্ক :

যখন বালক ছিলেম, ছিল না কেউ সাথি
দিন কেটেছে একা একা চেয়ে চেয়ে দূরের দিকে।
জন্মে ছিলেম অনাচারের অনাদৃত সংসারে, চিহ্নমোছা, প্রাচীরহারা।
প্রতিবেশীর পাড়া ছিল ঘন বেড়ায় ঘেরা
আমি ছিলেম বাইরের ছেলে নাম-না-জানা।
ওদের ছিল তৈরি বাসা, ভিড়ের বাসা—
ওদের বাঁধা পথের আসা-যাওয়া দেখেছি দূরের থেকে
আমি ব্রাত্য, আমি পংক্তিহারা।
বিধান-বাঁধা মানুষ আমাকে মানুষ মানেনি,
তাই আমার বন্ধুহীন খেলা ছিল সকল পথের চৌমাথায়
ওরা তার ওপাশ দিয়ে চলে গেছে বসনপ্রান্ত তুলে ধরে।

বালকের বেড়ে ওঠার মর্মের এই রূঢ় বিচ্ছিন্নতাবোধের উপলব্ধির হদিশ পেলাম আমরা। টের পেলাম এই বিচ্ছিন্নতা কী করে তাঁকে আরো ব্যাপ্ত করছে—তাই আমার-বন্ধুহীন খেলা ছিল সকল পথের চৌমাথায়। আর এই সম্প্রসারণের চিত্রকথা আরো অপরূপ আলোয় পেয়ে যাবো পরের পংক্তিগুলিতেই :

দলের উপেক্ষিত আমি মানুষের মিলন-ক্ষুধায় ফিরেছি,
যে মানুষের অতিথিশালায় প্রাচীর নেই, পাহারা নেই,
লোকালয়ের বাইরে পেয়েছি আমার নির্জনের সঙ্গী
যারা এসেছে ইতিহাসের মহাযুগে
আলো নিয়ে, অস্ত্র নিয়ে, মহাবাণী নিয়ে।
তারা বীর, তারা তপস্বী, তারা মৃত্যুঞ্জয়,
তারা আমার অন্তরঙ্গ, আমার স্ববর্ণ; আমার স্বগোত্র,
তাদের নিত্যশুচিতায় আমি শুচি।

দলে ঠাঁই না পাওয়া মন প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে আসা সাধক, প্রেমিক, পাগলদের কাছে আশ্রয় চেয়েছে, পেয়েছেও। এই আশ্রয়, এই একাত্মতাবোধ তাঁকে দিয়েছে সমাজকে ছাপিয়ে যাওয়া, সামাজিক মাত্রায় সীমাকে টপ্‌কে যাওয়া এক আলোকসামান্য আত্মপরিচয়। আর এই উপলব্ধির উদ্‌ভাসে বলীয়ান মন প্রার্থনা করে মানুষের মুক্তির, পরিত্রাণের। সদর্পে ঘোষণা করে আরো একবার—আমি ব্রাত্য, আমি জাতিহারা :

'হে চিরকালের মানুষ, হে সকল দেশের মানুষ,
পরিত্রাণ করো

ভেদচিহ্নের তিলক-পরা সংকীর্ণতার ঔদ্ধত্য থেকে।
হে মহান পুরুষ ধন্য আমি, দেখেছি তোমাকে তামসের পরপার হতে
আমি ব্রাত্য, আমি জাতিহারা।'

এই সদর্পে উচ্চারণ ক্ষমতাই তাঁকে মিলিয়ে দেবে সমাজের অবহেলিত, নিপীড়িত মানুষদের সঙ্গে, যাঁর প্রকাশ এই কবিতার শুরুর দিকেই আমরা পেয়েছি। এবার পিছিয়ে গিয়ে সেই জায়গার সঙ্গে মিলে যাবো আমরা :

ওরা অন্ত্যজ ওরা মন্ত্রবর্জিত।
দেবালয়ের মন্দিরদ্বারে পূজাব্যবসায়ী ওদের ঠেকিয়ে রাখে।
ওরা দেবতাকে খুঁজে বেড়ায় তাঁর আপন স্থানে
সকল বেড়ার বাইরে সহজ ভক্তির আলোকে,
নক্ষত্রখচিত আকাশে,
পুষ্পখচিত বনস্থলীতে,
দোসর জনার মিলন-বিরহের গহন বেদনায়।
যে দেখা বানিয়ে-দেখা বাঁধা ছাঁচে
প্রাচীর ঘিরে দুয়ার তুলে
সে দেখার উপায় নেই ওদের হাতে।

সাধারণ মানুষের ধর্ম নিজেদের যাপনেই উপলব্ধি করা 'সহজিয়া' ধর্ম, গূঢ় জীবনবর্জিত, শাস্ত্রসর্বস্বতায় যে ধার্মিকতা নিহিত তার সঙ্গে কোনো যোগ নেই এর। 'দোসর জনার মিলন-বিরহের গহন বেদনায়' তারা বুঝে নেয় তাদের গোপাল, তাদের কানাই, তাদের কেষ্টঠাকুরকে।

'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কম্‌নে আসে যায়'—'গোরা' উপন্যাসের একদম সূচনাতেই রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন লালন। ধর্ম এবং আত্ম-অনুসন্ধানের এই বিচিত্র উপন্যাসটির আবহে লালনের এই ছায়াপাত নিছক বিচ্ছিন্ন নয়। 'মনের মানুষটিরে' খুঁজে বেড়ানো এই মানুষটি যে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের আত্মানুসন্ধানকেও প্রভাবিত করেছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই :

কতদিন দেখেছি ওদের সাধককে
একলা প্রভাতের রৌদ্রে সেই পদ্মানদীর ধারে,
যে নদীর নেই কোনো দ্বিধা পাকা দেউলের পুরাতন ভিত ভেঙে ফেলতে
দেখেছি একতারা-হাতে চলেছে গানের ধারা বেয়ে
মনের মানুষকে সন্ধান করবার গভীর নির্জন পথে।

এই সাধনার একদিকে রয়েছে প্রতিষ্ঠানকে ভেঙে ফেলার অনায়াস গতি যা পদ্মার সহজ ধ্বংসলীলার সঙ্গে তুলনায় উল্লেখিত। অন্যদিকে রয়েছে ভালোবাসার মন্ত্র নিয়ে একান্ত মগ্নতায় হাঁটা। এ দুই মিলে লালন। এ দুই মিলে রবীন্দ্রনাথও।

৩

ব্রাহ্ম পরিবারে জন্ম নেওয়া রবীন্দ্রনাথ বড় হয়েছেন ব্রাহ্মসমাজের চলনপথে। পিতার মুখেও শুনেছেন নানা শাস্ত্রের আলোচনা। নিজেও পাঠ করেছেন। ব্রাহ্মসমাজের জন্য গানও বেঁধেছেন বছরের পর বছর নানা উৎসবে। এসবে কি তৃপ্ত হয়েছে তাঁর ধর্ম জিজ্ঞাসা, পরমকে অনুসন্ধান? না একেবারেই না :

শুনেছি যাঁর নাম মুখে মুখে, পড়েছি যাঁর কথা নানা ভাষায় নানা শাস্ত্রে।
কল্পনা করেছি তাঁকেই বুঝি মানি।
তিনিই আমার বরণীয় প্রমাণ করব ব'লে পূজার প্রয়াস করেছি নিরন্তর।
আজ দেখেছি প্রমাণ হয়নি আমার জীবনে।
কেননা, আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন।
মন্দিরের রুদ্ধদ্বারে এসে আমার পূজা বেরিয়ে চলে গেল
দিগন্তের দিকে—
সকল বেড়ার বাইরে নক্ষত্রখচিত আকাশতলে, পুষ্পখচিত বনস্থলীতে
দোসর জনার মিলন-বিরহের বেদনাবন্ধুর পথে।

'নক্ষত্রখচিত আকাশ', 'পুষ্পখচিত বনস্থলী' আর 'দোসর-জনার মিলন বিরহের গহন বেদনা'র উল্লেখ এর আগে এই কবিতাতেই আমরা পেয়েছি সাধারণ, ব্রাত্য মানুষের সহজ ভক্তির কথায়। কবিও নিজেকে মিলিয়ে ছিলেন তাদের সঙ্গে। বাড়তি রাখলেন শুধু 'বেদনাবন্ধুর পথ' যা তাঁর সাধনার নামান্তর। লালন হাঁটেন গভীর নির্জন পথে, মনের মানুষকে হারিয়ে খুঁজে বেড়ান দেশ-বিদেশে। কবিও তাঁর জীবনের ধ্রুবতারা কাদম্বরীকে পার্থিবজগতে হারিয়ে তাঁকে সন্ধান করেন বেদনাবন্ধুর পথে :

যে গিয়েছে দেখার বাহিরে
আছে তার উদ্দেশে চাহিরে
স্বপ্নে উড়িছে তারি কেশরাশি
পূরবপবনবেগে।

প্রেম যদি রবীন্দ্রনাথের ধর্মোপলব্ধির একপ্রান্তময় তবে অপরপ্রান্ত প্রকৃতি। প্রকৃতির অন্তঃস্থলে যে প্রবলপ্রাণ বিকীর্ণ, Pantheist-রা যাকে বলবেন anima mundi তাকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের চেতনায় নিজস্ব মননে উপলব্ধি করেছেন :

বালক ছিলেম যখন, পৃথিবীর প্রথম জন্মদিনের আদিমন্ত্রটি
পেয়েছি আপন পুলককম্পিত অন্তরে—আলোর মন্ত্র।
পেয়েছি নারকেল-শাখার ঝালর-ঝোলা আমার বাগানটিতে,
ভেঙে-পড়া শ্যাওলা ধরা পাঁচিলের উপর একলা বসে।
প্রথম প্রাণের বহ্নি উৎস থেকে নেমেছে তেজোময় লহরী,
দিয়েছে আমার নাড়ীতে অনির্বচনীয়ের স্পন্দন।

আমার-চৈতন্যে গোপনে দিয়েছে নাড়া অনাদিকালের কোন অস্পষ্ট বার্তা
প্রাচীন সূর্যের বিরাট বাষ্পদেহ বিলীন আমার অব্যক্ত সত্তার রশ্মি স্ফুরণ।
হেমন্তের রিক্তশস্য প্রান্তরের দিকে চেয়ে
আলোর নিঃশব্দে চরণধ্বনি, শুনেছি আমার রক্তচাঞ্চল্যে।
পড়তে পড়তে অবধারিত মনে গুঞ্জরিত হচ্ছে গানের চরণ :
অসীমকালের যে হিল্লোলে জোয়ার-ভাঁটায় ভুবন দোলে
নাড়ীতে মোর রক্তধারায় লেগেছে তার টান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।।
ঘাসে ঘাসে পা ফেলেছি বনের পথে যেতে।
ফুলের গন্ধে চমক লেগে উঠেছে মন মেতে,
ছড়িয়ে আছে আনন্দেরই দান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।
কান পেতেছি, চোখ মেলেছি, ধরার বুকে প্রাণ ঢেলেছি
জানার মাঝে অজানারে করেছি সন্ধান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।
আবার ফিরে আসি আলোচ্য কবিতার আলোকিত স্তবকটিতে :
বিস্ময়ে আমার চিত্ত প্রসারিত হয়েছে অসীমকালে, যখন ভেবেছি
সৃষ্টির আলোকতীর্থে সেই জ্যোতিতে আজ আমি জাগ্রত
যে জ্যোতিতে অযুতনিযুত বৎসর পূর্বে সুপ্ত ছিল আমার ভবিষৎ।
আমার পূজা আপনিই সম্পূর্ণ হয়েছে প্রতিদিন
এই জাগরণের আনন্দে।

তাহলে এই বিস্ময়ে জেগে থাকা, এই ঘাসে পা ফেলা, এই ফুলের গন্ধে চমকে ওঠার আপাততুচ্ছ ও অগভীর ছড়িয়ে থাকা আনন্দকে কুড়িয়ে বেড়ানোই তাঁর পূজা, তাঁর ধর্মাচরণ, তাঁর পরমকে সন্ধান? হ্যাঁ, তাই। এই খন্ড, তুচ্ছ, সামান্যকে অন্তত, ধারাবাহিক অনন্তের সঙ্গে সংপৃক্ত করতে পারাটাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ধর্ম!

৪

একদিন বসন্তে নারী এল সঙ্গীহারা আমার বনে প্রিয়ার মধুর-রূপে।
এল সুর দিতে আমার গানে
নাচ দিতে আমার ছন্দে, সুধা দিতে আমার স্বপ্নে।
উদ্দাম একটা ঢেউ হৃদয়ের তট ছাপিয়ে হঠাৎ হল উচ্ছলিত—
ডুবিয়ে দিল সকল ভাষা, নাম এল না মুখে।
সে দাঁড়ালো গাছের তলায়,
ফিরে তাকালো আমার কুণ্ঠিত বেদনাকরুণ মুখের দিকে।

ত্বরিত পদে এসে বসল আমার পাশে।
দুই হাতের মধ্যে আমার হাত তুলে নিয়ে বললে—
'তুমি চেন না আমাকে, তোমাকে চিনিনে আমি,
আজ পর্যন্ত কেমন করে এটা হল সম্ভব
আমি তাই ভাবি।'
আমি বললেম, 'দুই না-চেনার মাঝখানে
চিরকাল ধরে আমরা দুজনে বাঁধব সেতু,
এই কৌতুহল সমস্ত বিশ্বের অন্তরে।

আমি পাঠকদের বিশেষভাবে চিহ্নিত অংশগুলির দিকে তাকাতে বলবো। সঙ্গীহারা, সঙ্গীবিহীন না কিন্তু! অর্থাৎ এখানে কৈশোরের একাকিত্বের কথা নয়। কেউ একজন সঙ্গী ছিলেন যাঁকে কবি হারিয়েছেন তাঁর কথা বলা হচ্ছে। বলাই বাহুল্য, ইনি কাদম্বরী। কবির বিবাহের কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু। মৃণালিনী তাঁকে দেখছেন 'কুণ্ঠিত বেদনাকরুণ' মুখেই। বেদনাকরুণ হবার কারণ অবশ্যই বউঠানের মৃত্যুর গভীর ছায়াপাত। কিন্তু কুণ্ঠিত? অন্য নারীর শোকের এই মগ্নতা স্ত্রীর সামনে মুখাবয়বে কুণ্ঠা আনবেই বই কি। এখানেই মৃণালিনীর রবিজীবনে অসীম অবদান যার কথা কবি উল্লেখ করছেন ১৯২৪ এ ২রা নভেম্বর লেখা 'কৃতজ্ঞ' কবিতায় :

একদিন তুমি দেখা দিয়েছিলে বলে
গানের ফসল মোর এ জীবনে উঠেছিল ফলে,
আজো নাই শেষ।

'উদ্দাম একটা ঢেউ হৃদয়ের তট ছাপিয়ে হঠাৎ হল উচ্ছলিত—ডুবিয়ে দিল সকল ভাষা'র মধ্যে এসেছে। 'কড়ি ও কোমল' কাব্যগ্রন্থে ফুটে ওঠা তীব্র Passion যার রেশ 'মানসী' কাব্যগ্রন্থের 'অপেক্ষা' কবিতাতেও পাওয়া যায় :

আঁধারে যেন দু'জনে আর
দু'জন নাহি থাকে।
হৃদয় মাঝে যতটা চাই
ততটা যেন পুরিয়া পাই,
প্রলয়ে যেন সকল যায়,
হৃদয় বাকি রাখে।
... ...
দু'দিক হতে দু'জনে যেন
বহিয়া খরধারে
আসিতেছিল দোঁহার পানে
ব্যাকুলগতি ব্যগ্রপ্রাণে

সহসা এসে মিশিয়া গেল
নিশীথ পারাবারে।

এই passion যে কত গভীরে বয়েছিলো তা 'কৃতজ্ঞ' কবিতায় মৃণালিনীর স্মৃতি চারণার অনুষঙ্গে এসে গিয়েছে খুব অনায়াসেই—সেদিনের চুম্বনের পরে। কত নববসন্তের মাধবীমঞ্জরী থরে থরে শুকায়ে পড়িয়া গেছে। যাই হোক, আলোচ্য কবিতায় কবির অপূর্ণতা, আত্মসমালোচনার সুরও এসে গিয়েছে। যা দিতে পারেননি এসে পড়েছে তার কথা :

অল্পবেগের সেই প্রবাহ বহে চলেছে প্রিয়ার সামান্য প্রতিদিনের
অনুচ্চ তটচ্ছায়ায়।
অনাবৃষ্টির কার্পণ্যে কখনো সে হয়েছে ক্ষীণ,
আষাঢ়ের দাক্ষিণ্যে কখনো সে হয়েছে প্রগল্‌ভ।
তুচ্ছতার আবরণে অনুজ্জ্বল অতি সাধারণ স্ত্রী-স্বরূপকে,
কখনো করেছে লালন, কখনো করেছে পরিহাস,
আঘাত করেছে কখনো বা।

'আবরণ' শব্দটি এখানে বিশেষ তাৎপর্যবাহী। যখনি বাইরের থেকে দেখার চেষ্টা তখনি ভুল, পরিহাস বা আঘাত তো নিন্দনীয়ই। কিন্তু লালন? এর মধ্যেও কি একটা দখলদারি নেই? কবি যেন এই আপাত সদর্থক ক্রিয়াটিকেও একটু হাল্কাভাবে বিঁধে নিলেন।

এবার আসা যাক অন্য ধারায় কাদম্বরীর অনুষঙ্গে :

সে এসেছে অপরিসীম ধ্যানরূপে আমার সর্বদেহে মনে,
পূর্ণতর করেছে আমাকে, আমার বাণীকে।
জ্বেলে রেখেছে আমার চেতনার নিভৃত গভীরে চিরবিরহের প্রদীপশিখা।

জগদীশ ভট্টাচার্য তাঁর কবিমানসীতে দেখিয়েছেন কিভাবে কাদম্বরী হয়ে ওঠেন কবির জীবনদেবতা, 'কবির অন্তরের কবি' যিনি কবিকে লিখিয়ে চলেছেন। কাব্য ও জীবনের তিনি guardian angel, ধ্রুবতারা, প্রেরণাদাত্রী এবং সমস্ত বিচ্যুতির কঠোর সমালোচক :

কখনো বিপথে যদি ভ্রমিতে চায় এই হৃদি
অমনি ও মুখ হেরি শরমে সে হয় সারা

কিংবা

সুর ভুলে যেই ঘুরে বেড়াই কেবল কাজে
তোমার চোখের ভর্ৎসনা যে।

এই চোখের ভর্ৎসনার কথাই এসে যাবে এই কবিতায় এক অপরূপ পৌরাণিক চিত্রকল্পে :

ইতিহাসের সৃষ্টি আসনে ওকে দেখেছি বিধাতার বামপাশে।
দেখেছি সুন্দর যখন অবমানিত কদর্য কঠোরের অশুচিস্পর্শে
তখন সেই রুদ্রাণীর তৃতীয়নেত্র থেকে বিচ্ছুরিত হয়েছে প্রলয়-অগ্নি,
ধ্বংস করেছে মহামারীর গোপন আশ্রয়।

আমরা বুঝি এই রুদ্রাণী কেবল রবীন্দ্রনাথের ত্রুটি বিচ্যুতিই দগ্ধ করেন না, তাঁকে জ্বলে

উঠতে শেখান অন্যায়, অত্যাচারের বিরুদ্ধে। জালিয়ানাওয়ালাবাগ বা হিজলী জেলের নারকীয়তার পর এই রুদ্রাণীই গর্জে ওঠেন, কবিকে দেন প্রতিবাদের ভাষা। রুদ্রাণীর উল্লেখের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ আনলেন তাঁর জীবনের প্রতিবাদী সক্রিয়তার অংশ।

৫

আমার গানের মধ্যে সঞ্চিত হয়েছে দিনে দিনে
সৃষ্টির প্রথম রহস্য—আলোকের প্রকাশ,
আর সৃষ্টির শেষ রহস্য—ভালোবাসার অমৃত।

'আরো আলো, আরো আলো, এই নয়নে প্রভু ঢালো'

'আরো প্রেমে, আরো প্রেমে মোর আমি ডুবে যাক নেমে'—এই দুই গভীর প্রার্থনায় আলোকিত রবিজীবন। সুরলোকে যখন তিনি শঙ্খ শুনতে পান তখন নরলোকের জয়ডঙ্কা ও তাঁর শ্রুতি এড়াতে পারে না :

সকল মন্দিরের বাহিরে আমার পূজা আজ সমাপ্ত হল
দেবলোক থেকে মানবলোকে,
আকাশে জ্যোতির্ময় পুরুষে আর
মনের মানুষে আমার অন্তরতম আনন্দে।

লক্ষনীয়। 'জ্যোর্তিময় পুরুষ' বললেন, 'মনের মানুষ' কিন্তু মানুষই। আর এখানে আবার মেলাালেন লালনের সঙ্গে নিজেকে, সেই লালন যিনি মনের মানুষের খোঁজে গভীর নির্জন পথে এগিয়ে যান।